মুসলমানের 'খালি জীবন' ও বাংলাদেশ ক্যাম্প

পারভেজ আলম

গত ১ জুলাই গুলশানের একটি রেস্তোরাঁয় যে নির্মম হত্যাকান্ড হয়েছে তা হতবিহ্বল করেছে বাংলাদেশের মানুষকে, একইসঙ্গে অনেক প্রশ্নও হাজির করেছে। যারা খুনি এবং যারা এই নৃশংসতার শিকার তারা কারা? আর বাংলাদেশের বাদবাকি মানুষদের অবস্থা কী? ইসলাম কী বলে? মানুষ কীভাবে তার অবস্থান পাল্টায়? এসব প্রশ্ন নিয়েই এই জরুরী লেখা।

এক.

গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে আইসিস সমর্থক জঙ্গিদের হামলা ও জিম্মি সংকটের পর এদেশে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলোর উপস্থিতি নিয়ে সকল সন্দেহ ও জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটেছে বলা যায়। ২০-২১ বছর বয়সী কিছু তরুণ আইসিসের সমর্থক বেকারিটিতে হামলা করে উপস্থিত সবাইকে শুরুতে জিম্মি করল, তারপর বেছে বেছে ২০ জন জিম্মিকে জবাই করে হত্যা করল। এই ২০ জনের মধ্যে ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ ও গর্ভবতী নারীও ছিলেন, ছিল অনাগত শিশু। তাদের অধিকাংশেরই নিহত হওয়ার পেছনে কারণ ছিল তারা বিদেশি, অমুসলিম ইত্যাদি। হিজাব না পরাও কারো জন্য মৃত্যুর কারণ হয়েছে। আবার বিধর্মী ও বিদেশি বন্ধুকে ত্যাগ না করার ফলেও একজনকে নিহত হতে হয়েছে। 'জিম্মি' শব্দটি বাংলায় এখন আমরা ব্যবহারিক অর্থে ইংরেজি 'হস্টেজ' শব্দের অনুবাদ হিসেবে ব্যবহার করলেও উৎসগতভাবে ও ঐতিহাসিকভাবে এই শব্দেটি মুসলিম দুনিয়ায় ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এসেছে আরবি 'ধিম্মি' শব্দ থেকে, ক্লাসিক্যাল ইসলামে শব্দটির আইনগত গুরুত্ব ছিল। প্রাচীনকালে মুসলিম দুনিয়ায় 'ধিম্মি' বলতে মুসলিম দুনিয়ায় বসবাসকারী অমুসলিম প্রজাদের বোঝানো হতো। হস্টেজ শব্দের বাংলা হিসেবে জিম্মি শব্দটি অনেকটা 'বন্দি' শব্দের সমার্থক হলেও ক্লাসিক্যাল ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ ছিল রক্ষিত (protected)। জিম্মির জানমাল রক্ষার দায়িত্ব জিম্মাদারের। আধুনিক যুগে ইসলামি আইনে 'ধিম্মা' বা 'জিম্মা'র ধারণার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল প্রাচীন দুনিয়ার মুসলিমশাসিত অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও আইনগত বহুত্ব রক্ষার একটি প্রচেষ্টা।[১] প্রাচীন মুসলিম দুনিয়ায় 'জিম্মি' একটি আইনগত ক্যাটাগরি হওয়ায় এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত অমুসলিমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন ও নিজ নিজ ধর্মীয় আইন অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কিছু অধিকার লাভ করত, যে অধিকার রক্ষা করা ছিল মুসলিম শাসকের দায়িত্ব। মুসলিম শাসনের অধীনে অমুসলিমদের এই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে কোনোভাবেই আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান ধর্মীয় অধিকারের সাথে তুলনা করা না গেলেও প্রাচীনকালে তুলনামূলকভাবে মুসলিম দুনিয়ায় প্রচলিত এই ধিম্মা ব্যবস্থা ছিল মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে প্রচলিত অন্যান্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থক। উমাইয়া অথবা আব্বাসীয়দের সমসাময়িক খ্রিস্টান দুনিয়ায় যেহেতু খ্রিস্টান বাদে অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য কোনো আইনগত ক্যাটাগরি ছিল না, ফলে তাদের ধর্ম পালনের অধিকার কোনো আইন দ্বারা রক্ষিতও ছিল না।

> হস্টেজ শব্দের বাংলা হিসেবে জিম্মি শব্দটি অনেকটা 'বন্দি' শব্দের সমার্থক হলেও ক্লাসিক্যাল ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ ছিল রক্ষিত (protected)। জিম্মির জানমাল রক্ষার দায়িত্ব জিম্মাদারের।

ঠিক কোন কোন ধর্মের অনুসারীরা মুসলিম শাসনের অধীনে 'ধিম্মি' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইহুদি, খ্রিস্টান, মাজদিকি, সাবিয়ান ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত ধর্মের অনুসারীদের, ইরানে জোরাস্ট্রিয়ান ধর্মের অনুসারীদের এবং ভারতবর্ষে হিন্দুদের ধিম্মি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ধিম্মিদের ধর্মীয় আচার ও আইনের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও মুসলিম আলেম-ওলামারা তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় আইন অনুসরণের অধিকার অস্বীকার করতেন না। যেমন চৌদ্দ শতকের বিখ্যাত হাম্বলিবাদী ওলামা ইবনে কাইয়িম আল জাওজিয়াহকে দেখা যায়, তিনি জোরাস্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বীদের প্রচলিত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিবাহের রীতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেও মুসলিম শাসনের অধীনে তাদের নিজ ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিবাহের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন।[২] উল্লেখ করা দরকার যে চৌদ্দ শতকের মুসলিম দুনিয়ায় পূর্ববর্তী সময়কার বহুধর্মীয় সহাবস্থান ও সহনশীলতার ঐতিহ্য অনেকখানিই ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং নয়া হাম্বলিবাদী কট্টরপন্থার উত্থান ঘটেছিল। তার পরও জোরাস্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বী অগ্নিপূজকদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন অনুসারে অজাচারের অধিকারকেও তারা মেনে নিয়েছে। ধিম্মি বা জিম্মি শব্দের ইসলামি আইনগত ব্যবহার ও জিম্মিদের অধিকার বিষয়ে বাঙালি মুসলমানদের বিশেষ ধারণা না থাকলেও 'ইসলামি রাষ্ট্র' নামের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থকদের ধারণা থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া 'ইসলামি রাষ্ট্রে'র সমর্থকরা তাদের হাতে জিম্মি অমুসলিম ও ভিনদেশিদের বেছে বেছে হত্যা করল।

শুধু যে তাদের হত্যাই করা হয়েছে তা নয়, হত্যার আগে নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের কথা মুক্তি পাওয়া জিম্মিদের মুখে আগেই শোনা গিয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত নিহত ইতালীয় নাগরিকদের ময়নাতদন্তে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, হত্যার জন্য বেছে নেওয়া জিম্মিদের ত্বরিত নয়, কষ্ট ভোগ করে মৃত্যু নিশ্চিত করাই ছিল জঙ্গিদের উদ্দেশ্য। জঙ্গিদের সাথে জিম্মি হওয়া এই মানুষগুলোর কোনো বাস্তব শত্রুতা ছিল না, তার পরও তাদের এভাবে নির্যাতন করে, কষ্ট দিয়ে হত্যা করার কারণ কী? নির্যাতিত না হওয়ার অধিকার তো শুধু আধুনিক দুনিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারই নয়, ইসলামি ঐতিহ্যেও একটি স্বীকৃত অধিকার। চরম শত্রুকেও কষ্ট দিয়ে হত্যা করার পক্ষে ইসলামি ঐতিহ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ইসলামি আইনে প্রচলিত যেসব শাস্তির বিধানকে আধুনিক যুগে বর্বর বলা যায়, সেগুলোকেও আধুনিক কালে প্রচলিত আইনের সংজ্ঞায় 'নির্যাতন' বলা যায় না।[৩]

এমনকি যুদ্ধাবস্থায়ও নিরস্ত্র মানুষ, আত্মসমর্পণকারী, নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা করার বিরুদ্ধে ইসলামি আইনের সুস্পষ্ট অবস্থান আছে। অবস্থান আছে নিহতের লাশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের বিরুদ্ধে।[৪] খোদ মহানবীর বাণী হিসেবে প্রচলিত বহু হাদিস পাওয়া যায়, যাতে যুদ্ধের সময়ও নারী ও শিশু হত্যার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়।[৫] তার পরও তথাকথিত 'ইসলামি রাষ্ট্রে'র সমর্থকরা যে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষ, নারী, অনাগত শিশু ও বৃদ্ধ হত্যার মতো কাজ ইসলামের নাম নিয়েও সংঘটিত করল, তা কিভাবে? কেন নয়, কিভাবে করতে পারল–সেটাই আসল প্রশ্ন। ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে এই ধরনের অপরাধ তারা ইসলামের নামে ইরাক-সিরিয়ায়ও সংঘটিত করে আসছে। যে যা-ই বলুক না কেন, এই জঙ্গিদের ইসলামের সাথে ঐতিহ্যবাহী ইসলামের চেয়ে নাজিবাদেরই মিল বেশি। আর তাদের শাসনাধীন বা তাদের জিম্মি অমুসলমানদের সাথেও ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে বসবাসকারী ভিন ধর্মের অমুসলমানদের মিল নেই, মিল আছে নাজিদের পরিচালিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের 'মুসলমান'দের।

দুই.

নাজিবাদীরা ছিল বর্ণবাদী। মানুষকে তারা বিভিন্ন বর্ণে ও ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছিল। সকল বর্ণের মানুষের মনুষ্যত্ব তারা সমান বিবেচনা করত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিরা জার্মানি, পোল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প পরিচালনা করত। এইসব ক্যাম্পে যাদের পাঠানো হতো, তাদের নাজিরা নিজেদের মতো মানুষ বলে বিবেচনা করত না। একজন আর্য জার্মানের মানুষ হিসেবে যেসব অধিকার ছিল, একজন ইহুদি অথবা কমিউনিস্ট অথবা জিপসি, যাদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হতো, তাদের সেই অধিকার ছিল না। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলো ছিল একেকটা সার্বভৌম অঞ্চল, যেখানে বাইরের পৃথিবীর আইনের কোনো দাম ছিল না, ছিল না সেখানে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের কোনো মানবাধিকার। ফলে তারা নির্যাতিত হতো, জীবন যাপন করত পশুর মতো। তারা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত, শেষে সাধারণত গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুবরণ করত। গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুবরণ করার জন্য যাদের নির্বাচন করা হতো, ক্যাম্পের মধ্যে তাদেরই প্রচলিত নাম ছিল মুসলমান। উল্লেখ্য যে জার্মান ভাষায় মুসেলমান (Muselmänn) শব্দটি মুসলিম বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাদের 'মুসলমান' বলা হতো তাদের প্রায় সবাই ছিল ইহুদি। ধর্মের কারণে নয়, বিশেষ এক ধরনের দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া মানুষদেরই এই নামে ডাকা হতো। আর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাদের 'মুসলমান' বলা হতো তাদের প্রায় সবাই ছিল ইহুদি। ধর্মের কারণে নয়, বিশেষ এক ধরনের দৈহিক ও মানসিক অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া মানুষদেরই এই নামে ডাকা হতো।

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নির্যাতন, পরিশ্রম, খাদ্যাভাব আর প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় বসবাসকারী মানুষরা খুব বেশিদিন বেঁচে থাকত না। তাদের গড় আয়ু ছিল মাত্র কয়েক মাস। ক্ষুধা আর ক্লান্তি মিলিয়ে একসময় তারা আর কোনো কাজ করতে পারত না, পায়ের পেশিতে ক্ষয় ধরার কারণে ঠিকমতো দাঁড়িয়েও থাকতে পারত না। ফলে তারা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত হাঁটুতে হাত রেখে, অনেকটা নামাজের সময় রুকু করার মতো। এ কারণেই ক্যাম্পের বৃদ্ধরা তাদের নাম দিয়েছিল মুসলমান। এই মুসলমানদেরই ঢোকানো হতো গ্যাস চেম্বারে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে জীবিত ফিরতে পারা একজন সাক্ষী প্রিমো লেভির ভাষায় এই মুসলমানদের 'কারো পক্ষে জীবিত বলা কঠিন। তাদের মৃত্যুকেও ঠিক মৃত্যু বলা যায় না'।[৬] লেভির মতে, তারাই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আসল সাক্ষী, তিনি জীবিত ফিরলেও আসল সাক্ষী নন। উল্লেখ করা দরকার যে ইসলামি পরিভাষায় শহিদ বলতে যে শব্দটি প্রচলিত আছে তার অর্থও সাক্ষী। কোরআন শরিফে তাদের মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এই লেখায় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের শাহাদাত প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াব না। তবে এ কথা বলা যায় যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের এই 'মুসলমানদের' জীবনকে আর যা-ই হোক মানুষের জীবন বলা যায় না। তাদের প্রাণ ছিল বটে, অর্থাৎ তারা প্রাণী ছিল বটে, কিন্তু নাজিদের কাছে তারা মানুষ ছিল না। তাই তাদের মানবাধিকারের বালাইও ছিল না। জর্জিও আগামবেন প্রশ্ন তুলেছেন, এই মুসলমানদের জীবন 'খালি জীবন' (bare life, vita nuda) কি না। তাদের জীবন আর যা-ই হোক রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত মানবজীবন নয়। তারা নির্যাতনযোগ্য ও নিধনযোগ্য ক্যাটাগরির মানুষ।

প্রাচীন গ্রিসে মানুষের জীবনকে দুটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করার প্রচলন ছিল। একটি হলো বায়োস (bios), অপরটি জো (zoe)। জো হলো জীবের জীবন (biological life)। এই জীবন 'খালি জীবন', কারণ যে ধরনের রাজনৈতিক স্বীকৃতি মানুষের জীবনকে অর্থ দান করে, নানা রকম অধিকারে আচ্ছাদিত করে রাখে, এই জীবনের সে ধরনের স্বীকৃতি নেই, অথবা রাজনৈতিকভাবে অস্বীকৃতি আছে। থমাস হবসের লেভিয়াথনে যে 'স্টেট অব নেচার'-এর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ আইনের শাসনের অনুপস্থিতিতে মানুষের জীবন যে অবস্থায় পতিত হয়, এই জীবন তেমনই জংলি জীবন। জঙ্গলের আইনে এই ধরনের জীবনের মূল্য নির্ধারিত হয়। হবসের ভাষায়, স্টেট অব নেচারে মানুষের এই জীবন হলো নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, নোংরা, নিষ্ঠুর ও ক্ষুদ্র। অন্যদিকে বায়োস হলো রাজনৈতিক মানুষের জীবন (political life), নগর সভ্যতায় যে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। অ্যারিস্টটলের ভাষায় ভালোবাসা, খালদুনের ভাষায় আসাবিয়া এবং হবসের ভাষায় সামাজিক চুক্তির মধ্য দিয়ে এই ধরনের জীবনের উদ্ভব। যে জীবন আইনের শাসন মেনে চলে এবং আইনের দ্বারা যার অধিকার রক্ষিত হয়, সেই জীবনই বায়োস। সোজা কথায়, বায়োস হলো নানাবিধ আইনের অধীন ও আইনের দ্বারা রক্ষিত অধিকারসমৃদ্ধ মানবজীবন। আগামবেনের মতে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মুসলমান কিংবা গুয়ানতানামো বের বন্দিদের প্রথম ক্যাটাগরির জীবন অর্থাৎ 'খালি জীবন' থাকলেও দ্বিতীয় ক্যাটাগরির জীবন (bios) নেই। গুলশান হামলায় অংশ নেওয়া জঙ্গিদের কাছেও তাদের ভিকটিমদের জীবন ছিল 'খালি জীবন'। তাদের কাছে এই মানুষরা মানুষ ছিল না, ছিল মানুষের চেয়ে কম কিছু, যাদের মানুষের অধিকার নেই, যাদের পশুর মতো নির্যাতন করা যায়, হত্যা করা যায়। এই ক্ষেত্রে তাদের কোনো দোষ থাকা প্রয়োজনীয় ছিল না, তাদের বয়স বা লিঙ্গও বিবেচনার বিষয় ছিল না।

তিন.

জর্জিও আগামবেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মুসলমানের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন মানুষের জীবনের যে বিভক্তি, তার বিলুপ্তি দেখতে পান। তার মধ্য থেকে নতুন জীবনের ধারণা উদ্‌ঘাটন করতে চান। তবে মানুষের 'রাজনৈতিক সত্তা'র কখনো পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে কি না

সন্দেহ আছে। মানুষের ইতিহাসে দেখা যায়, চরম নির্যাতন-নিপীড়নের মুখেও 'খালি জীবনে' পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে মানুষ নানা রকম সংগ্রাম জারি রেখেছে। মহানবী মুহাম্মদের (সা.) জীবন যার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার আগের কয়েক বছর তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ সময়টুকু পার করেছেন। এর মধ্যে একটি বছর ইসলামের ইতিহাসে 'দুঃখের বছর' (আ'ম আল হুজন) নামে পরিচিত। নতুন ধর্ম প্রচার করার পর থেকেই মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা মক্কার কুরাইশদের হাতে নির্যাতিত হতেন। কিন্তু মুহাম্মদ নিজেও ছিলেন কুরাইশ গোত্রজাত, এবং ছিলেন হাসেমি বংশের। উমাইয়াদের তুলনায় দরিদ্র হলেও কাবাঘরের রক্ষক হিসেবে এই বংশের বিশেষ মর্যাদা ছিল। অন্যদিকে হাসেমি বংশের নেতা দাদা আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালেবের কারণে মুহাম্মদ পুরো হাসেমি বংশের নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে ছিলেন। ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশরা মুহাম্মদকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়ার দায়ে পুরো হাসেমি বংশকেই সমাজচ্যুত করেছিল। তাদের সাথে কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। ফলে মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও অনুসারীরা দীর্ঘ সময় শিব আবু তালিব নামক একটি ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি মানুষদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পাওয়ায় একপর্যায়ে কুরাইশরা তাদের বয়কট তুলে নেয়।

এই ঘটনার বড় ধরনের প্রভাব পড়েছিল মুহাম্মদের স্ত্রী খাদিজার ওপর। বলা যায়, খাদিজার আশ্রয় ও প্রশ্রয়েই মুহাম্মদ একজন নবী হিসেবে তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন। খাদিজার অর্থসম্পদের জোরেই মুহাম্মদের পক্ষে একজন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করা সহজ হয়েছিল। ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে খাদিজাই ছিলেন প্রথম মুসলমান, এমনকি মুহাম্মদ নিজেও যখন তাঁর ওহিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না তখন তাঁর খ্রিস্টান স্ত্রী খাদিজাই তাঁকে সাহস দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন। খাদিজা একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, সারা জীবন প্রাচুর্যের মধ্যে কাটিয়েছেন। ক্যাম্পের দুঃসহ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জীবন তিনি সহ্য করতে পারেননি, পাশাপাশি এই সময়টিতে তাঁর যথেষ্ট বয়সও হয়েছিল। ফলে অচিরেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একপর্যায়ে মৃত্যুবরণ করেন। একই বছর মুহাম্মদ হারান তাঁর চাচা আবু তালেবকে, যিনি নিজে কখনো মুহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ না করলেও নিজ ভাতিজাকে সাধ্যমতো আগলে রেখেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন। সময়টা ছিল ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ, এই বছরটিই ইসলামের ইতিহাসে দুঃখের বছর বলে পরিচিত।

আবু তালেব ও খাদিজার মৃত্যু ছিল মুহাম্মদের জন্য বড় আঘাত। বলা যায়, এই সময়টিতে তিনি সবচেয়ে বেশি অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই বছরের আগের ও পরের মুহাম্মদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই বছরের আগের মুহাম্মদ ছিলেন বনি ইসরায়েলের ইয়ারমিয়া অথবা গ্রিসের কাসান্দ্রার মতো অনাগত দুঃসময়ের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা নবী। কিন্তু এই বছরের পরের মুহাম্মদ একজন আল্লাহর রাসুল এবং একজন রাজনৈতিক নেতা। তবে শুধুমাত্র দুঃখের বছরের সামাজিক বয়কট এবং স্বজন হারানোর বেদনাই তাঁকে অস্ত্র ধারণ করতে উৎসাহিত করেনি। সম্ভবত মুহাম্মদের রাজনৈতিক জীবন বোঝার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কুরাইশদের তাঁকে 'খালি' ঘোষণা করার ঘটনাটিকে আমল দেওয়া। ইসলামপূর্ব মক্কার গোত্রীয় আইন অনুসারে 'খালি' হলো একজন সমাজচ্যুত, সকল প্রকার গোত্রীয় নিরাপত্তা ও অধিকারবঞ্চিত মানুষ। জীবিত থাকার জন্য 'খালি' ঘোষিত মানুষের জন্য পলাতক, যাযাবর অথবা ডাকাতের জীবন বেছে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা একটি লিখিত প্রজ্ঞাপন জারি করে, যার মাধ্যমে মুহাম্মদের জীবনকে রক্তমূল্য-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করা হলে তা একটি সামাজিক বিচার বলে বিবেচিত হবে, হোমিসাইড বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ হত্যাকারীকে কোনো পাল্টা বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না বা রক্তমূল্য দিতে হবে না। অর্থাৎ মক্কার কুরাইশদের ঘোষণায় এ সময় মুহাম্মদের জীবন পরিণত হয়েছিল সকল প্রকার অধিকারবঞ্চিত ও আইনবহির্ভূত 'খালি জীবন' বা জীবের জীবনে। প্রাচীন রোমের আইনের পরিভাষা ব্যবহার করে এই ধরনের জীবনের নামই আগামবেন দিয়েছেন 'হোমো সাকের'।

হোমো সাকের এক ধরনের পবিত্র জীবন। 'খালি জীবন' বেছে নিতে অস্বীকারকারী মুহাম্মদ যে আল্লাহর রাসুলের পবিত্র পরিচয় গ্রহণ করেই নিজের খালি জীবনকে রাজনৈতিক জীবনে পরিণত করেছেন তাতে হয়তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি মক্কা থেকে পলাতক ছিলেন বটে, কিন্তু জংলি যাযাবরের জীবন বেছে নেননি। ডাকাতও হয়ে যাননি। হয়েছেন একজন রাজনৈতিক নেতা। মক্কার আইনে বহির্ভূত মুহাম্মদ নিজেই নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নতুন 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইয়াথরিবে। ইয়াথরিবের বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মানুষদের বিভিন্ন সামাজিক চুক্তির মধ্য দিয়ে নতুন একটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে ইয়াথরিবের নাম হয়েছিল মদিনা। এই ঘটনা একটি নগর পত্তনের ঘটনা। মূল হিজাজ ভূখণ্ডের আরবদের মদিনার আগে কোনো নগর ছিল কি? মক্কাকে আর যা-ই হোক নগর বলা যায় না। অন্যদিকে মদিনা শব্দের অর্থই হলো নগর। প্রাচীন আরবদের কাছে মদিনা তাই শুধু নগরই (city) ছিল না, ছিল নগরটি (the city)।

> জঙ্গিদের হাতে লেখক, প্রকাশক অথবা বিদেশি জিম্মিদের মৃত্যুতে যাঁরা সেক্যুলার বাংলাদেশের মৃত্যু দেখতে পান, তাঁদের শাওনের মৃত্যু নিয়ে উচ্চকিত হতে দেখা যায় না। বলতে শোনা যায় না যে শাওনের মৃত্যু বাংলাদেশের মৃত্যুরই নামান্তর। অন্যদিকে নিজেদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন নিয়ে সোচ্চার ইসলামিস্টদেরও বলতে শোনা যায় না যে শাওনের মৃত্যু ইসলামবিরোধী বা অনৈসলামিক। অথচ হাদিসে সুস্পষ্ট দেখা যায়, সন্দেহভাজন বলে মহানবী অপরাধীকে লাঠিপেটা করতেও অস্বীকার করেছেন।

চার.

গুলশান হামলার রাতে আহত হওয়া একজন মানুষ কয়েক দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ে পরাজিত হলেন। নাম তাঁর জাকির হোসেন শাওন। তিনি হলি আর্টিজান বেকারির একজন সহকারী বাবুর্চি ছিলেন। জঙ্গিদের নির্যাতনে নয়, তিনি নিহত হয়েছেন পুলিশি নির্যাতনে। ২ জুলাই রাতে বেকারির দেয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি, সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ তাঁকে আটক করেছিল। কিন্তু আটক এই সন্দেহভাজনকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই পুলিশ নির্যাতন করে মেরে ফেলল। পত্রিকার শিরোনামে তিনি একজন নিধনযোগ্য 'সন্দেহভাযন' এবং গুলশানে জঙ্গি হামলা ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় এই মানুষটির জীবনের মূল্য বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বলেই এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে। পুলিশের কাছে তাঁর জীবন 'খালি জীবন', রাজনৈতিক জীবন নয়।

আমাদের কাছেও তার বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে জঙ্গিদের হাতে লেখক, প্রকাশক অথবা বিদেশি জিম্মিদের মৃত্যুতে যাঁরা সেক্যুলার বাংলাদেশের মৃত্যু দেখতে পান, তাঁদের শাওনের মৃত্যু নিয়ে উচ্চকিত হতে দেখা যায় না। বলতে শোনা যায় না যে শাওনের মৃত্যু বাংলাদেশের মৃত্যুরই নামান্তর। অন্যদিকে নিজেদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন নিয়ে সোচ্চার ইসলামিস্টদেরও বলতে শোনা যায় না যে শাওনের মৃত্যু ইসলামবিরোধী বা অনৈসলামিক। অথচ হাদিসে সুস্পষ্ট দেখা যায়, সন্দেহভাজন বলে মহানবী অপরাধীকে লাঠিপেটা করতেও অস্বীকার করেছেন।

পুলিশি হেফাজত বা নির্যাতনে মৃত্যু বাংলাদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু এই যে একজন মানুষ জঙ্গিদের হাত থেকে বাঁচতে দেয়াল টপকে পালাতে গিয়ে তারপর বিনা দোষে পুলিশের কাছে নির্যাতিত হয়ে নিহত হলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত আপামর বাংলাদেশির প্রতীক হয়ে গেলেন। একজন খেটে খাওয়া সাধারণ বাংলাদেশি। তিনি কাউকে মারতেও যাননি, মেরে মরতেও যাননি। পেটের দায়ে ঐ রেস্টুরেন্টে চাকরি করতেন। জঙ্গিদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে দেয়াল টপকে পালাতে গিয়েছিলেন। তারপর পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। আপামর বাংলাদেশির তো এখন এ অবস্থাই। পেট্রোল বোমায়, জঙ্গিদের হামলায় অথবা পুলিশের হাতে নির্বিচারে যেকোনো সময় তাঁরা নিহত হতে পারেন। এই বাস্তবতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে নির্যাতিত ও নিহত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে। প্রতিটি বাংলাদেশিই আজ নিধনযোগ্য ক্যাটাগরির মানুষ। ক্রমাগত রাজনৈতিক অধিকারবঞ্চিত হতে হতে আমাদের জীবন এখন আর নগ্ন জীবনের চেয়ে বেশি কিছু নয়। হয় জঙ্গি অথবা পুলিশের কাছে নির্বিচারে নিহত হওয়াই এখন আমাদের ভাগ্য। আগামবেনের মতে, আধুনিক রাষ্ট্রগুলো এক ধরনের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পও বটে। 'স্টেট অব এক্সেপশন' রাষ্ট্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা নাজি ক্যাম্পের রূপ ধারণও করতে পারে। বর্তমান গ্লোবাল দুনিয়ার যে একক রাজনৈতিক কাঠামো, তাতে ইরাক-সিরিয়ার মতো দেশগুলো তো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পই বটে, এবং আধুনিক সভ্যতার 'স্টেট অব এক্সেপশন' ভিন্ন আর কি? বাংলাদেশও তো সেই ক্যাম্পে পরিণত হওয়ার পথেই।

প্লেটোর 'রিপাবলিক' থেকে ধার করে আল ফারাবি 'নগর'কে (একালের 'রাষ্ট্র') মানুষের দেহের সাথে তুলনা করেছিলেন। প্লেটোর মতোই তিনি দাবি তুলেছিলেন যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা-ই। ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নগর ছিল ইরিদু। সুমেরীয় মিথলজি অনুযায়ী, এই নগর বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। এখন আমরা জানি, বেহেশত থেকে নয়, মানুষের দেহের রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নগর গড়ে ওঠে, যেমন গড়ে উঠেছিল মদিনা। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্মও তো সেভাবেই। একাত্তরে পাকিস্তানিদের কাছে বাংলাদেশের মানুষের জীবন 'খালি জীবন' ছাড়া ভিন্ন কী ছিল? তাঁরা তো লাখে লাখে 'শহিদ' হয়েছেন। তাদের সাক্ষ্যে নিধনযোগ্য বাঙালির দেহের রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়েই তো এই রাষ্ট্রের জন্ম।

অল্পবয়স্ক তরুণ খুনি ও অল্প বয়সে খুন হয়ে যাওয়া তরুণদের এই বাংলাদেশে একজন অল্পবয়স্ক কবির কথা ইদানীং বেশ মনে পড়ছে। তাঁর নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলাদেশের জন্মের বহু আগেই তিনি লিখেছিলেন–'সাবাস বাংলাদেশ, পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়। জ্বলেপুরে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়বার নয়।' এখনো বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ মাথা নোয়াবে না। যে দেশের মানুষ একাত্তরে 'খালি জীবন' পরিণত হতে অস্বীকার করেছিল, লাখো জীবনের রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রের জন্ম সে তো 'মদিনা' হতে পারে, ক্যাম্প হবে কেন?

পারভেজ আলম : লেখক, ব্লগার
ই-মেইল : stparvez@gmail.com

পাদটীকা

১. Tengku Ahmad Hazri (2016). The Rule of Law in Islam: Between Formalism and Substantivism. Islam and Civilization Renewal. Vol 7.No 1. P. 73.

২. Ibid. P. 73.

৩. Sadiq Reza (2007). Torture and Islamic Law. Chicago Journal of International Law. Vol 8. No 1. PP. 22-23.

৪. Malik's Muwatta. Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Abu Bakr as-Siddiq was sending armies to ash-Sham,,Abu Bakr said, "I will not ride and you will not get down. I intend these steps of mine to be in the way of Allah,,I advise you ten things. You must not mutilate dead bodies. Do not kill women or children or an aged, infirm person. Do not cut down fruit-bearing trees. Do not destroy an inhabited place. Do not slaughter sheep or camels except for food. Do not burn bees and do not scatter them. Do not steal from the booty, and do not be cowardly. Book 021, Hadith Number 008.

৫. Saheeh Bukhari. Narrated By Ibn 'Umar : During some of the Ghazawat of Allah's Apostle a woman was found killed, so Allah's Apostle forbade the killing of women and children. Volume 004, Book 052, Hadith Number 258.

৬. Primo Levi (1959). If this is a man. Translated from the Italian by Stuart Woolf. The Orion Press. P. 103.

তথ্যসূত্র

Tengku Ahmad Hazri (2016). The Rule of Law in Islam: Between Formalism and Substantivism. Islam and Civilization Renewal. Vol 7. No 1.
Sadiq Reza (2007). Torture and Islamic Law. Chicago Journal of International Law. Vol 8. No 1.
Primo Levi (1959). If this is a man. Translated from the Italian by Stuart Woolf. The Orion Press.
Giorgio Agamben.(1998). HOMO SACER. Sovereign Power and Bare Life. Translated by Daniel Heller-Roazen. Stanford University Press.
AZIZ AL-AZMEH (2014). THE EMERGENCE OF ISLAM IN LATE ANTIQUITY, Allah and his People. Cambridge University Press.